সমকাল

তারিখ ...2 6 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে

শিক্ষা | এএন রাশেদা

সম্পাদক, শিক্ষাবার্তা

১৯৭১ সালে অনেক রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটিতে ৩৬টি অধ্যায় ছিল এবং ৩৫নং অধ্যায়টি ছিল- 'শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান'।

বাজেটে শিক্ষা খাতে আনুমানিক বরাদ্দ কয়েক বছর ধরে ক্রমেই কমে আসার কারণে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় চলছে ভয়ানক অরাজকতা ও অচলাবস্থা। যেমন- ২০০৯-১০ অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল ১৪.৬৭ শতাংশ। ক্রমেই তা কমে ১৩.৬১ শতাংশ, ১৩.১৩, ১২.৩২, ১১.৫১, ১১.৭ এবং সর্বশেষ ১০.৭ শতাংশ। অথচ ১৯৭৪ সালের মে মাসে প্রকাশিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, যা ড. কুদরাত-এ-খুদা কমিশন নামে পরিচিত, সেখানে 'শিক্ষার জন্য অর্থসংস্থান' অধ্যায়ে ৩৫.৯ প্যারায় বলা হয়েছে, 'বিশ্বের উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় তাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমাংশে বহু অগ্রসর দেশের শিক্ষায় শুধু সরকারি ব্যয়ই ছিল জাতীয় আয়ের ৫ থেকে ৮ শতাংশের মধ্যে। অথচ এ সময়ে বাংলাদেশের অনুপাত ছিল ১ শতাংশের মতো এবং ১৯৭২-৭৩ সালে ব্যয় বরাদ্দের হিসাব অনুযায়ী তা প্রায় ১.৮ শতাংশ।' রিপোর্টের ৩৫.১০ প্যারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'আমরা এ সত্য এড়াতে পারি না যে, শিক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় আয় এবং সরকারি ব্যয়ের আরও বড় অংশ বরাদ্দ করলে তবেই এ রিপোর্টে প্রস্তাবিত শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থাগুলো কার্যকর করা যাবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, '১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষামন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৪ থেকে ৫ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় আদর্শরূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল।' আর ৩৫.১১ প্যারায় বলা হয়েছে- 'এসব বিষয় বিবেচনা করে আমাদের সুপারিশ এই যে, আমাদের শিক্ষা খাতে ব্যয় অবিলম্বে মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশে উন্নীত করা দরকার এবং এ ব্যয়ের পরিমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব ৭ শতাংশ করা জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।' তারা আরও বলেছেন, অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের গুরুত্ব সত্ত্বেও আমাদের উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।'

এতদিনে এই বরাদ্দ জাতীয় বাজেটের ৩০ শতাংশেরও বেশি হওয়া উচিত, যা কখনোই খেলাপি ঋণের দশায় পরিণত হবে না। বরং তা বর্ধিত হয়ে স্বাস্থ্য, প্রতিবেশ, পরিবেশ ও সংস্কৃতিতে এক অত্যুজ্জ্বল সুন্দর সমাজ গড়ে তুলবে। গত বছর জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১০.৭ শতাংশ। কেউ হয়তো বলবেন যে, সে টাকাই তো খরচ করতে পারছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিলাসবহুল গাড়ি কিনে এবং টাকা আকাশে উড়িয়েও শেষ করতে পারছে না, বাড়তি টাকা কী করবে? তাই প্রশ্ন আসতে পারে, ২৫-৩০ শতাংশ খরচ করবে কীভাবে? উত্তর হলো- এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব আছে। অবশ্য আরও বর্ধিত হতে পারে-

১. যেহেতু গ্রামাঞ্চলের প্রায় সব শিক্ষার্থী নিম্নআয়ের পরিবারের এবং ঝরে পড়ার হার সেখানে খুবই বেশি। তাই এ হার কমাতে গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এক হাজার টাকা বয়স্ক ভাতার মতো শিক্ষা ভাতা দিতে হবে।

২. যারা নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইবে তাদের ভাতা দুই হাজার টাকা দিতে হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শাখায় থাকলে। ফলে গ্রামাঞ্চলে অর্থপ্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। গ্রামের মানুষ হাঁস, মুরগি, ছাগল, ভেড়া, গাভী প্রতিপালনে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ পাবে এবং স্কুলে শিশুদের মধ্যাহ্ন আহারে প্রোটিন থাকা বাঞ্ছনীয় করতে হবে এবং তা গ্রাম থেকেই পাওয়া যাবে।

৩. দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হতে হবে। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত।

৪. প্রত্যেক স্কুলে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি যথার্থ অর্থেই থাকতে হবে ডেমোনেস্টেটর, থাকতে হবে লাইব্রেরি, লাইব্রেরিয়ান পদ এবং পড়ার ও বই নেওয়ার সুযোগ।

৫. প্রত্যেক স্কুলে রান্নাঘর থাকতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার রান্না করা যাবে এবং ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের কার্যক্রম চলতে পারবে।

৬. যারা বিএসসি বা বিএ পড়ে স্কুল শিক্ষকতা পেশায় আসবে তাদের শিক্ষা-প্রণোদনা চার হাজার টাকা দিতে হবে। ইন্টারমিডিয়েটে তাদের জিপিএ ৪ থাকতে হবে এবং গ্র্যাজুয়েশন কোর্সে এডুকেশনের ওপর একটি অতিরিক্ত পেপার পড়তে হবে আর এ পেশার মানোন্নয়ন অর্থাৎ পৃথক বেতন স্কেল দিতে হবে।

৭. যারা অনার্সে ভর্তি হবে তাদের মেধাবৃত্তি চার হাজার টাকা দিতে হবে। স্বল্প আয়ের বাবা-মার সন্তানরা মেধাবৃত্তি না পেলে দুই হাজার টাকা প্রণোদনা ভাতা দিতে হবে।

৮. যারা দ্বাদশের গ্রেড ২.৫ পেয়ে ভোকেশনালের বিভিন্ন শাখায় (প্রকৌশল, মেডিকেল, ডেন্টাল, কৃষি বা যে কোনো) যাবে, তাদের প্রণোদনা ভাতা দুই হাজার টাকা করে দিতে হবে।

৯. মাস্টার্সের পর যারা গবেষণা করতে চাইবে তাদের প্রভাষকের মর্যাদা দিতে হবে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে পারবে। তবে তার স্থায়িত্ব নির্ভর করবে কাজের অগ্রগতির ওপর।

১০. কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যারা শিক্ষকতার পেশায় আসতে চায় শুধু তারাই মাস্টার্স করার সুযোগ পাবে এবং যাদের ফল সবসময়ের জন্যই সর্বোচ্চ। যারা অন্য কোনো পেশায় যেতে আগ্রহী তাদের ৩ বছরের পাসকোর্স বা ৪ বছরের অনার্স কোর্স শেষ ধাপ বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে যা বিদ্যমান আছে।

শিক্ষার সার্বিক ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করলে সমাজ অতি দ্রুত তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। সেই লক্ষ্য- ৩০ লাখ শহীদের স্বপ্ন, ৩ লাখ মা-বোনের অপরিসীম কষ্ট ও অসহ্য নরক-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সব মানুষের কাঙ্ক্ষিত সেই সাম্যের দেশ। শিশু যখন শিক্ষা ভাতা পাবে তখন ওই অবহেলিত শিশুকে বাবা-মা যেমন বুকে টেনে নেবে, তেমনি এতিম বলে যাদের দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল আত্মীয়-স্বজন তার অভিভাবকত্ব নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে। রাস্তাঘাট-স্টেশনে যেসব শিশু পড়ে থাকে, তখন তাদের ঠিকানা জুটে যাবে। কারণ তাদের হাতে শুধু বই-খাতা থাকবে না, থাকবে মাস মাস কিছু অর্থ এবং স্কুলে দুপুরে পেট পুরে খাবার। এতে পুষ্টি সুরক্ষাও ঘটবে। রাজীব, রাজন, রাকীবদের মতো শিশুদের খেলার বয়সে শ্রম দিতে গিয়ে করুণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হবে না। এই স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম শিক্ষার্থীদের ওপর যেমন বিশাল প্রভাব ফেলবে, তেমনি পরিবারেও স্বস্তি আসবে। উল্লেখ্য, এই স্কুল ফিডিং প্রকল্প ভারতে ২০০১ সাল থেকে চলছে, তবে ছুটির দিনে ছিল না। সম্প্রতি সর্বোচ্চ আদালত সরকারগুলোকে গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময়ও স্কুল শিক্ষার্থীদের খাবার সরবরাহের নির্দেশ দিয়েছেন।

সব শেষে বলতে চাই, সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনতে হলে পাঠ্যবই ১০০ কোটি বা তারও বেশি প্রয়োজন হবে। বিদেশ থেকে বা শুধু ঢাকা থেকে ছাপানো নয়, আধুনিক টেকনোলজিতে সব জেলা শহরে বই ছাপানোর দায়িত্ব দিয়ে প্রায় সব অঞ্চলকে কর্মক্ষম রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়ে বহু কর্মসংস্থানও ঘটবে, প্রতি বছর তা বাড়বে। দু-একজনকে শতকোটি বানানোর চিন্তা সরকারকে বাদ দিতে হবে। হলফ করেই বলা যায় এবং দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, শিক্ষায় ২৫-৩০ শতাংশ বিনিয়োগে প্রথম বছরেই আশ্চর্যজনক ফল রাষ্ট্র পাবে, যা ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখার মতো লাভজনক বা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। জনগণের সম্পদ জনগণের সমৃদ্ধির জন্যই বিনিয়োগ করতে হবে। মুষ্টিমেয় মাফিয়াচক্রের জন্য তা হতে পারে না। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনেক দেশেই 'মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়' বলা হয়।



সব শেষে বলতে চাই, সবাইকে শিক্ষার আওতায় আনতে হলে পাঠ্যবই ১০০ কোটি বা তারও বেশি প্রয়োজন হবে। বিদেশ থেকে বা শুধু ঢাকা থেকে ছাপানো নয়, আধুনিক টেকনোলজিতে সব জেলা শহরে বই ছাপানোর দায়িত্ব দিয়ে প্রায় সব অঞ্চলকে কর্মক্ষম রাখতে হবে। এর মধ্য দিয়ে বহু কর্মসংস্থানও ঘটবে, প্রতি বছর তা বাড়বে। দু-একজনকে শতকোটি বানানোর চিন্তা সরকারকে বাদ দিতে হবে। হলফ করেই বলা যায় এবং দিব্যদৃষ্টিতে দেখা যায়, শিক্ষায় ২৫-৩০ শতাংশ বিনিয়োগে প্রথম বছরেই আশ্চর্যজনক ফল রাষ্ট্র পাবে, যা ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখার মতো লাভজনক বা তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি